শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা

রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সচিব অর্ণব রায়ের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে (No.632-ES(EE)/ RTE Cell-43/2013 - the 3rd July 2013) গত ২৪ জুলাই, ২০১৩ গেজেটে প্রকাশ করে বলা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার (প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি) ক্ষেত্রে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) এবং উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষার (পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি) ক্ষেত্রে জেলা বিদ্যালয়ে পরিদর্শক (মাধ্যমিক) শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ পেলে তদন্ত, শুনানীর মাধ্যমে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ এবং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার রুল, ২০১২ অনুযায়ী অভিযোগ নিষ্পত্তি করবেন। অভিযোগকারী জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের আদেশে সন্তুষ্ট না হলে তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন প্রোটেকশন অথরিটির চেয়ারপারসনের কাছে আবেদন জানাতে পারেন।

সমপথ

জুলাই-অগস্ট ২০১৩

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

> ''শিশুর যে কোনো প্রকার বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হল - সুস্থ শারীরিক বৃদ্ধি। সেজন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পুষ্টি, শারীরিক ব্যায়াম এবং উপযুক্ত সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ।''
>
> **-জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫**

মিড-ডে মিল

বিদ্যালয়ে ভর্তি, বিদ্যালয়ে থাকা এবং নিয়মিত হাজিরার হারের বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর পুষ্টির উন্নতি ঘটানোর জন্য ১৯৯৫ সালের ১৫ অগস্ট প্রাথমিক শিক্ষায় পুষ্টি সহায়তা জাতীয় কর্মসূচি শুরু করা হয়। প্রাথমিকভাবে দেশের ২৪০৮ টি ব্লকে শুরু করা হয়েছিল। ১৯৯৭-৯৮ সালের মধ্যে সারা দেশের সমস্ত ব্লকে এই কর্মসূচি প্রয়োগ করা হয়। পরিসর বৃদ্ধি করে ২০০২ সালে কেন্দ্র পরিচালিত শিক্ষা নিশ্চয়তা প্রকল্প, বিকল্প ও উদ্ভাবনী শিক্ষা এবং মাদ্রাসা/মক্তবকেও এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ভরা হয়। এই প্রকল্প ২০০৬-০৭ সালে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০৯-১০ সাল থেকে এন সি এল পি বিদ্যালয়কেও এই প্রকল্পে যুক্ত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে রান্না করা মিড ডে মিল কর্মসূচি শুরু হয় ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৬টি জেলার ১১০০ বিদ্যালয়ে। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত, ৬৯,৪৮৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৮,৯২০ টি বিদ্যালয়কে মিড-ডে মিলের আওতায় আনা গেছে এবং ১৪৯৬১ টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩৯১৬ টি বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল সরবরাহ সম্ভব হয়েছে।

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মাঝে মাঝে এই প্রকল্প সংশোধিত হয়েছে।

১ ডিসেম্বর, ২০০৯ থেকে কার্যকর খাদ্য সংক্রান্ত মান নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	প্রতিদিন শিশুর প্রতি পরিমাণ	
		প্রাথমিক	উচ্চ প্রাথমিক
১	খাদ্য শস্য	১০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম
২	ডাল	২০ গ্রাম	৩০ গ্রাম
৩	শাক-সবজি	৫০ গ্রাম	৭৫ গ্রাম
৪	তেল এবং স্নেহ পদার্থ	৫ গ্রাম	৭.৫ গ্রাম
৫	লবণ এবং মশলা	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী

১ জুলাই, ২০১২ থেকে কার্যকর হওয়া সংশোধিত রান্নার খরচঃ-

স্তর	মোট (টাকা)	কেন্দ্র-রাজ্য ভাগ	
		কেন্দ্র	রাজ্য
প্রাথমিক	৩.৩৩	২.৩৩	১.০০
উচ্চ-প্রাথমিক	৪.৬৫	৩.৪৯	১.১৬

২০১৩-১৪ সালের জন্য প্রস্তাবে প্রাথমিক স্তরের জন্য ৩.৫০ টাকা (কেন্দ্র ২.৫০ ও রাজ্য ১.০০) এবং উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে ৫.০০ টাকার (কেন্দ্র ৩.৭৫ ও রাজ্য ১.২৫) কথা বলা হয়েছে।

রাঁধুনি ও সহযোগী

- ২৫ জন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন রাঁধুনি ও সহযোগীর জন্য মাসিক সাম্মানিক ১০০০ টাকা।
- ২৬ থেকে ১০০ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য দুজন রাঁধুনি ও সহযোগী।
- একজন অতিরিক্ত রাঁধুনি ও সহযোগী প্রত্যেক অতিরিক্ত (১০০ জন পর্যন্ত) ছাত্র-ছাত্রীর জন্য।
- রাঁধুনি ও সহযোগীর সাম্মানিক বাবদ খরচের ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার ৭৫ ঃ ২৫ অনুপাতে বহন করবে।

রান্না করা মিড-ডে মিল ও তদারকি পদ্ধতি কর্মসূচিতে প্রকল্প অধিকর্তা, জেলা শাসক ও অন্যান্য নোডাল আধিকারিকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য ও তদারকি পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গে মিড-ডে মিল কর্মসূচির নোডাল কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। জেলা শাসক তাঁর এলাকায় মিড-ডে মিল কর্মসূচি প্রয়োগে জেলার নোডাল আধিকারিক। তিনি এবং তাঁর অধীন মহকুমা শাসক এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এই প্রকল্প রূপায়ণে প্রধান দায়িত্ববান ব্যক্তি। *এর পর ৪-এর পাতায়*

৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশুর উপযুক্ত স্থান হল বিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

মিড–ডে মিল প্রকল্প – আরো যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন

মিড-ডে মিল প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর থেকে বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে। মিড-ডে মিল থাকবে কিনা, বা পড়াশোনায় এর প্রভাব কতটা পড়ছে সে বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতামত। এর সঙ্গে শিক্ষকদের যুক্ত থাকার বিষয়টিও যথেষ্ট আলোচিত। এই নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্কও রয়েছে। তবে একশ্রেণির পড়ুয়ারা যে এই মিড-ডে মিলের কারণেই বিদ্যালয়মুখী হয়েছে এ বিষয়টাও অনেকে স্বীকার করেছেন। মিড-ডে মিল চালু হওয়ার পর থেকে দেখা গেছে পরিকাঠামোগত সমস্যা মিড-ডে মিলকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করতে বাধা দিয়েছে। বেশিদিন নয় আমরা সাম্প্রতিক কালের ঘটনাগুলি দেখলেই বুঝতে পারব যে কিভাবে একটি শিশুবান্ধব প্রকল্প শিশুবিরোধী হতে পারে। মিড-ডে মিল প্রকল্পের খাবারের নিম্নমান, রান্না ও খাওয়ার স্থানের অভাব, তদারকির অভাব ইত্যাদি সমস্যা তো ছিলই, এছাড়াও রয়েছে নিম্নমান ও অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ছাত্র-ছাত্রীর অসুস্থতা এমনকি মৃত্যুও। বিহারে ২৩টি শিশুর প্রাণ আমাদের টনকটা আবার নাড়িয়ে দিল। এরসঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও মিড-ডে মিলে আরশোলা, টিকটিকি পাওয়াটা এখন প্রায় নিয়মিত হয়ে গেছে। সমপথের এই সংখ্যাটি আমরা মিড-ডে মিল নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করলাম। এরসাথে ওয়েবেন আয়োজিত একটি নমুনা সমীক্ষার সংক্ষিপ্ত ফলাফল দেওয়া হল। আর মিড-ডে মিলের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে পাঠকদের আর একবার পরিসংখ্যানগুলিকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। মিড-ডে মিল সংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় সরকারি তথ্য রয়েছে যেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয়েছে। মূলত এই প্রকল্পটি নিয়ে আবার নতুন করে ভাবনা চিন্তা করা এই সময়ে দাঁড়িয়ে খুবই জরুরী বলে আমাদের মনে হয়েছে। শিশু সুরক্ষার স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এই প্রকল্পকে আরও সাফল্য মন্ডিত করে তোলা দরকার।

দায়িত্ব আমাদের সকলের।

মাননীয় কর্তৃপক্ষ
ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক

সবিনয় নিবেদন,

গত ৩০ জুলাই ২০১৩ আপনাদের সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ আলোচনাসভায় উপস্থিত থেকে আমার মতো সামান্য এক শিক্ষকের কিছু উপলব্ধি প্রকাশ করার ইচ্ছা নিয়ে এই পত্রের অবতারনা। 'গুণমানের শিক্ষা ও শিক্ষার অধিকার আইন' শীর্ষক এই আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি, বিশেষ করে বর্তমান সময়ের প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে শিক্ষা নয়–দুপুরের খাদ্যই প্রাধান্য পাচ্ছে। সামান্য একজন শিক্ষক হিসেবে ১৮ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় বলি শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে শিক্ষা প্রদানের শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও সঠিক পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকদের বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকদের প্রথমেই পঠন-পাঠনের আগে যেটা চিন্তাভাবনা করতে হয় কি করে, কিভাবে ছেলেমেয়েদের দুপুরের খাবার তৈরি করিয়ে যথোপযুক্তভাবে তাদের মুখে তুলে দেওয়া যাবে। জ্বালানি কোথায় পাওয়া যাবে, কাঠ হলে কাঁচা কিনা, ওজনে কম কিনা, বাজারদর অনুযায়ী দাম ঠিক নিচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। এরপর কাঠ জোগাড় হলে, রাঁধুনিরা প্রয়োজনের বেশি কাঠ জ্বালিয়ে দিচ্ছে কিনা তাও দেখতে হবে। নাহলে ৩ টাকা ৩৩ পয়সায়, জ্বালানি সহ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার কিভাবে দেওয়া যাবে তা তাঁকেই ভাবতে হবে। পত্রলেখকের স্কুলে প্রতিদিন রাঁধুনিরা দেড়পন (১ পন = ৮০টি) ঘুঁটে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেন, কয়লা প্রায় ২০ কেজি, কেরোসিন ব্ল্যাকে ৪০ টাকা লিটার দরে কিনতে হয়। ওই সকল জিনিস জোগাড় করা কিন্তু খুবই কঠিন। ৯ জন রাঁধুনি দুটি দল করে পালাবদল করে একদিন পর পর রাঁধেন। কয়লা যখন গনগন করে তখন রান্না হয়ে যায়। বাকি আঁচে জল দিয়ে ওই কয়লা বস্তা করে বাড়িও নিয়ে যায়। অভাবের সংসার তাদের। কিছু বলাও যায় না। একটু জোর করলে আবার রাজনৈতিক দলের কথা আভাসে শুনিয়ে দেয়। জ্বালানি তো হল এবার প্রতিদিন পঠন-পাঠনের শুরুর আগে ছাত্র-ছাত্রী গোনা, কে কে খাবে, কে কে খাবে না–হিসেব করে সেই পরিমাণ চাল ওজন করে দিতে হয়। বাজার সরকার আসেন। তিনি অধিকাংশ দিনই শুকনো, নাহলে পচনশীল কাঁচা আনাজ গছানোর চেষ্টা করেন। এখানে শিক্ষকদের নজর রাখতে হয়। ওজনের মার আছে, পারলে ওজন করে নেওয়া প্রয়োজন। এরপর মুদিখানা—ডাল, তেল, নুন, মশলাপাতির দৈনন্দিন তালিকা তৈরি করে মাল নিয়ে রান্না চড়ানো হয়। একটু নজর না দিলে রাঁধুনিরা নিজেদের জন্য ওই রান্নাই আলাদা সরিয়ে রাখে। ঘন ডাল তাদের জন্য পাতলা জল শিক্ষার্থীদের। চাটনি হলে কম চিনি দিয়ে শিক্ষার্থীদের—রাঁধুনিদের আলাদাভাবে তৈরি হয়। প্রধান শিক্ষক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষককে কতজন খাবে, কত মালপত্র দেওয়া হল তা সরকারি নির্দেশে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে লিখে দিতে হয়। এরপর রাঁধুনিদের খেল—পাশাপাশি বাড়ি হলে কেউ চলে যায় বাড়িতে। কেউ গাই (গরু) দিয়ে দুধ বিলি করে আসেন। কেউ রান্নার ফ্যান, কাঁচা আনাজের খোসা গরুকে খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যায় —একটু সার্চ করলে ওই কাঁচা আনাজের বাতিল খোসা বা ফ্যানের মধ্যে গোটা আনাজ বা গোটা আলুও আপনি পেতে পারেন। কেউ বা পেট কাপড়ের খুঁটে লঙ্কা, হলুদ, জিরে গুঁড়োর প্যাকেটও পুরে নেয় অতি সন্তর্পনে।

এবার দুপুরে টিফিনের সময় খাদ্য পরিবেশন। রাঁধুনিরা যতটা পারেন শিক্ষার্থীদের কম দিয়ে যত বেশি বাঁচাতে পারবেন ততই ভাল। বাড়িতে যে ততক্ষনে পাত পেড়ে বসে আছেন অন্য সদস্যরা। অনেক সময় রাতের খাওয়াও হয়ে যায়। যেদিন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নজরে একটু চাপাচাপিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে—সেদিন রাঁধুনিদের মুখ ভার। বাড়িতে যে মালপত্র বেশি যাবে না।

এই হল মিড-ডে মিলের বাস্তব চিত্র বেশিরভাগ স্কুলেই। অবশ্য যে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়—তবে সে সংখ্যা খুবই কম। আর অনেক সময় ওই সকল রাঁধুনিদের যে পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সরকারের তরফে ওই সামান্য অর্থের কথা ভেবে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা কিছু বলতেও পারেন না। দেখেও না দেখার ভান করেন।

এই যখন অবস্থা তখন গুণমানের শিক্ষা কিভাবে সম্ভব। এর উপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী, করনিক নেই যেটা প্রাথমিক (৫ম-৮ম শ্রেণি) বিদ্যালয়ে আছে। মিড- ডে মিলের জন্য অনেকগুলি খাতাও মেনটেন করতে হয়। এর উপর আছে আবার অডিটের জুজু। ঠিকমতো হিসাব না রাখা হলে শিক্ষকদের সম্মানহানি, এমনকি চোরের বদনামও জুটতে পারে।

একটা প্রস্তাব দিই। যদি মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখতেই হয় তবে গুণগত মানের শিক্ষা পেতে ওই বিভাগটি অন্য কারও উপর অর্পণ করা উচিত। শিক্ষকদের কাজ শিক্ষা দেওয়া। সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় মেনে চলা অবশ্যই উচিত একথা ভাববার সময় হয়েছে। আর একটা কথা পত্রলেখকের যতটুকু ধারণা আমাদের রাজ্যের সব জেলায় সব গ্রামে সব স্কুলে মিড-ডে মিলের প্রয়োজন নেই। তাই যে যে জেলায় খুবই পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ মানুষের বসবাস সেখানে মিড-ডে মিলের চালু রাখাই দরকার। আর যদি একান্তই দরকার হয় তবে সব জেলায় সব গ্রামে সব বিদ্যালয়ে চালু না রেখে প্রত্যেক গ্রামে ১টি বা ২টি বিদ্যালয়ে মিড-ডে চালু করা যাক অন্য বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে মিল বন্ধ থাক। সেখানে শুধুই পড়া-শোনা চলুক। যাদের শুধু বিদ্যার্জনই প্রয়োজন তারা মিড-ডে মিলহীন বিদ্যালয়ে যাক, যারা খাদ্য ও পড়া দুটিই প্রয়োজন মনে করবে, তারা মিড-ডে মিলের বিদ্যালয়ে যাবে। এটা ভাবা যেতে পারে।

ওয়েবেনের 'শিক্ষাক্ষেত্রে মিড-ডে মিলের প্রভাব' এই সমীক্ষায় পাওয়া গেছে অনেক তথ্য। তবে আমার একটা মতামত আছে। পড়াশুনার উপর মিড-ডে মিলের প্রভাব খুবই পড়ে। ওই সমীক্ষায় শিক্ষকবৃন্দ যে উত্তর দিয়েছেন আমার মতে তা অনেকটা অসত্য। কিছুটা ভয়ে বলেছেন যদি উপরওয়ালা কিছু বলেন। আমার নিজস্ব দেখা পাশের উচ্চ বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল শুরু হয় দুটি করে শ্রেণি হিসেবে দুপুর ১২ টা থেকে — শেষ হয় দুপুর ২টোর পর। এভাবে খাওয়াতে গিয়ে পড়াশুনোর ব্যাপক ক্ষতি হতে বাধ্য। যতই শিক্ষকরা না বলুন।

আবার নতুন নতুন নির্দেশ আসছে। 'আগমার্কা' সরষে তেল ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষকদের খাদ্য তৈরির পর তা খেয়ে দেখে কিছুক্ষণ পরে তবেই শিক্ষার্থীদের দিতে হবে ইত্যাদি। এরপর হয়ত বলা হবে মাঠে ফসল ফলিয়ে সেই ফসল ছাত্রদের টাটকা খাওয়াতে হবে। নানা বিধান। মিড-ডে মিলের যাঁতা কলের শিক্ষা বিপর্যস্ত। দুটি শ্রেটি তৈরি হচ্ছে সমাজে। এক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বেসরকারি বিদ্যালয়ে যাচ্ছে সেখানে দুপুরের রান্না করা খাওয়ার পরিবর্তে পঠন-পাঠনই শুধু হয় এই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পিতামাতারা অর্থ খরচ করে তাঁদের সন্তানদের পড়াচ্ছেন। ক্রমশ এই ধরণের স্কুলের দিকেই অভিভাবকরা ঝুঁকছেন। আর অন্য হতদরিদ্র শ্রেণি মানুষ তাঁদের সন্তানদের অর্থের অভাবে দুপুরের রান্না করা খাবার দেওয়া স্কুলে পাঠাচ্ছেন দুটো খাওয়া সঙ্গে কিছুটা অক্ষর পরিচয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক একটা সমীক্ষায় রিপোর্ট পেয়েছে। বয়স্ক শিক্ষায় আমাদের রাজ্য সবচেয়ে পিছনের আসনে। বহু পিছিয়ে পড়া বিহার রাজ্য যেখানে ৮৬.৩৪% নম্বর তুলেছে আমাদের রাজ্য সেখানে মাত্র ৪২%। কি লজ্জার কথা!

আর একটি সমীক্ষার ফল আমাদের অবশ্যই ভাবাবে। সম্প্রতি ASER একটা রিপোর্ট পেশ করেছে। ২০০৬ সালে গ্রামাঞ্চলে যেখানে বেসরকারি স্কুলে ১৮% শিশু পড়তে যেত, ২০১২ সালে ওই সংখ্যা ২৮%। অর্থাৎ সরকারি ব্যবস্থায় প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে গত ৬ বছরে ১০% ছাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে বেসরকারি শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে। একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে হয়ত উত্তর পাওয়া যাবে এই দ্রুত বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির আগ্রহের কারণ হয়ত মিড-ডে মিল!! অদূর ভবিষ্যতে কি রাজ্যের সরকার পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শেষ হয়ে যাবে? আমরা দেখার অপেক্ষায় রইলাম।।

বিনীত
তপনকুমার দাস, হুগলীজেলা
বিঃদ্রঃ - মতামত পত্রলেখকের একান্তই ব্যক্তিগত

ওয়েবেন আয়োজিত গুণমানের শিক্ষা ও শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক আলোচনা সভা

গত ৩০ জুলাই ২০১৩ কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর সভাগৃহে গুণমানের শিক্ষা ও শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে ওয়েবেন। এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন রাইট টু এডুকেশন প্রোটেকশন অথরিটির চেয়ারপার্সন প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী সাধন কুমার গুপ্ত এবং Consultant-UNICEF, RtE Cell-এর শ্রী মেচবাহার সেখ। সভার শুরুতেই ওয়েবেনের জন্য আহ্বায়িকা দীপালি নন্দী স্বাগত ভাষণে এই আলোচনা সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান। এই সভায় ওয়েবেনের পক্ষ থেকে নিবিড় গ্রাম প্রচার অভিযানের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি প্রকাশ করেন শ্রী সত্য গোপাল দে, শ্রী মেচবাহার সেখ এবং বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রী মৃণ্ময় ভট্টাচার্য্য। শ্রী সাধন গুপ্ত তাঁর বক্তব্যে শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে পরিকাঠামোর অভাব, বিভিন্ন মানুষের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। তিনি তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। এরপর গুণমানের শিক্ষা ও শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক আলোচনা সভায় বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পূর্ব মেদিনীপুরের এ.আই তিমির বরণ জানা, শিক্ষক সুর্য্যাংশু ভট্টাচার্য্য, সিএসিএল-এর পক্ষ থেকে বিপ্লব দাস, এন.সি.পি.সি.আর পক্ষ থেকে পার্থ রায়, বিক্রমশীলার পক্ষ থেকে অতনু সাঁই, ক্রাই-এর পক্ষ থেকে জিতেন্দ্র রথ, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে রাজকুমার রাহা প্রমুখ। এরপর উপস্থিত অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের মতামত পেশ করেন। সবশেষে বক্তব্য রাখেন মেচবাহার সেখ ও অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য। শ্রী সেখ বলেন যে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকাঠামো বা অন্যান্য বিষয়ে যতটুকু নজর দেওয়া হয়েছে, গুণমানের শিক্ষায় সেভাবে কোনো নজর দেওয়া হয়নি। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও, তা গুণমানের শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে নয়। তিনি সংগঠনগুলির মাধ্যমে অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে পরিদর্শনের প্রস্তাব দেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের কথা বলেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন রেপার চেয়ার পার্সন জাস্টিস সাধন গুপ্ত

এরপর অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের মতামত পেশ করেন। আলোচনান্তে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে একত্রে কাজ করার জন্য বেশ কিছু কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে পরিদর্শন, জনশুনানী, legal cell তৈরি করা, SMC ও SDP নিয়ে সরকারকে চাপ দেওয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদি। এই আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন সত্যগোপাল দে।

ওয়েবেন প্রেস মীট

২০১৩ সালে ওয়েবেনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ১১টি জেলায় নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই কর্মসূচির রিপোর্টটি রাজ্যের গণ মাধ্যমের কাছে তুলে ধরার জন্য ৩১ জুলাই ২০১৩ কলকাতা প্রেস ক্লাবে ওয়েবেনের পক্ষ থেকে একটি প্রেস মীটের আয়োজন করা হয়। ওয়েবেনের পক্ষ থেকে এই প্রেস মীটে বক্তব্য রাখেন রাজ্য আহ্বায়িকা দিপালী নন্দী, রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য স্বপন পন্ডা এবং ক্রাই-এর পক্ষ থেকে সত্য গোপাল দে। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব চিত্র ও এই গ্রাম প্রচার কর্মসূচির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ওয়েবেনের পক্ষ থেকে এই বছরও এই নিবিড় গ্রামপ্রচার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরা ২০৬টি গ্রামে ৮৯২ জন শিশু পেয়েছেন যারা বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। এছাড়াও ওই গ্রামগুলির ২৩৪টি বিদ্যালয়ে এখনো পর্যন্ত শিক্ষা অধিকার আইন মোতাবেক ন্যূনতম পরিসেবার অভাবে রয়েছে বলে রিপোর্টে প্রকাশ। এই বিষয়গুলি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ওকালতি করবেন বলে ওয়েবেনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

ওয়েবেন আয়োজিত প্রেস মীট

ওয়েবেন জেলা নেটওয়ার্কের সাংগঠনিক সভা

২০১৩-১৪ সময়কালের নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ওয়েবেনের জেলা নেটওয়ার্কগুলি তাদের সাংগঠনিক সভাগুলি আয়োজন করে। এই সভায় মূলত এই বছরের পরিকল্পনা ও সেগুলি রূপায়ণ করার বিষয়টি আলোচিত হয়। পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মালদা জেলায় সদস্যরা এই সভাগুলির আয়োজন করেন।

ওয়েবেনের অভিযোগের ভিত্তিতে বাঁকুড়া জেলার স্কুলকে সতর্ক করল রেপা

শিক্ষা অধিকার আইন অমান্য করে ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য বাঁকুড়ার একটি স্কুলকে টাকা ফেরতের নির্দেশ দিল রেপা (রাইট টু এডুকেশন প্রোটেকশান অথরিটি)। বাঁকুড়ার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রোল চৌধুরী মুহাম্মদ তৈয়ক ইন্সটিটিউশন-পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য বিনা রসিদে ২০ টাকা করে ফর্ম বিক্রি করে। পরীক্ষাও নেওয়া হয়। নেওয়া হয় 'ক্যাপিটেশন ফি'। যা বিনা ব্যয়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ এর পরিপন্থী। কয়েকজন অভিভাবক জেলাশাসক ও ডি আই, সেকেন্ডারি এডুকেশন দপ্তরে অভিযোগ করেন। পুনরায় এসআই-তে অভিযোগ করেন সেখ সাহাজুল ও ডালিম মন্ডল। আবেদন পত্রের কপি ওয়েবেনকেও দেওয়া হয়।

এই আবেদন পত্রের ভিত্তিতে ওয়েবেন থেকে 'রেপা'কে বিষয়টি জানানো হয়। বিভিন্ন পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি হয়। তাতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাঁর ভুল স্বীকার করে নেন এবং বিনা রসিদে নেওয়া অর্থ স্কুল বোর্ডে নোটিশ টাঙিয়ে ফেরত দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রচার অভিযানের প্রতিবেদনের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

১ পাতার শেষাংশ.... একইভাবে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক) তাঁর সহ আধিকারিকদের সাথে এই প্রকল্পের দৈনন্দিন তদারকির জন্য দায়িত্ববান ব্যক্তি। মিড-ডে মিল কার্যকরী করার বিভিন্ন স্তর -

এ) প্রয়োজনীয় অর্থ এবং খাদ্য শস্য সংগ্রহ এবং সেগুলি প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে বন্টনের ব্যবস্থা করা।

বি) সারা রাজ্যের সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে ১ম-৮ম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রান্না করা মিড-ডে মিলের যথাযথ সরবরাহ।

সি) প্রকল্পটির প্রয়োগের পূর্ণাঙ্গ তদারকি।

ডি) সরকারি নিয়ম অনুযায়ী রিপোর্ট এবং হিসাব-নিকাশ পেশ করা।

প্রকল্প অধিকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য -

রাজ্যস্তরে প্রকল্প অধিকর্তা হলেন রান্না করা মিড-ডে মিল প্রকল্পের মুখ্য কার্যকরী আধিকারিক। তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি নিম্নরূপ -

- রাজ্য স্তরে প্রকল্পটির সম্পূর্ণ দেখাশোনা ও তদারকি করা।
- সব জেলার জেলা শাসক ও মিড-ডে মিল সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য সংস্থাগুলির কাছ থেকে মাসিক রিপোর্ট সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- মিড-ডে মিল সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদনসহ জেলাগুলিতে অর্থ বরাদ্দ করা।
- রাজ্যে প্রকল্পটির যথাযথ প্রয়োগ এবং সমন্বয়ের জন্য ভারত সরকারসহ জেলাগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা।
- ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, খাদ্য দপ্তর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্ক ও সমন্বয় বজায় রাখা।
- রাজ্য স্তরে প্রকল্পটির গুণগত মান সহ প্রয়োগের বিষয়টি পরিদর্শন করার জন্য সংস্থা নিয়োগ করা।
- Web-based software এর মাধ্যমে প্রকল্পটির যথাযথ পর্যবেক্ষণের জন্য সংস্থা নিয়োগ করা।
- প্রকল্পের প্রয়োগের কোনো ব্যর্থতা অথবা দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করা এবং রাজ্য সরকারকে সমাধানের জন্য পরামর্শ দেওয়া।
- রাজ্যে প্রকল্পের যথাযথ প্রয়োগ ও জনচেতনা সৃষ্টির জন্য রিপোর্ট প্রকাশ করা, হ্যান্ড আউট ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন মাধ্যমের ব্যবহার।
- মিড-ডে মিল বিষয়ে কোনো আইনি মামলায় অংশগ্রহণ করা এবং রাজ্য সরকারকে সে বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া।
- রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পের যথাযথ প্রয়োগের জন্য অন্য যে কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জেলা শাসক/পৌরসভার কমিশনারের (পৌরসভার বিদ্যালয়/ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যান, কলকাতা, (কলকাতার সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়)/প্রধান সচিব, DGHC-এর দায়িত্ব এবং কর্তব্য

- প্রকল্পের জন্য ধার্য করা অর্থ ও খাদ্য-শস্য গ্রহণ করা এবং মহকুমা শাসক (SDO) ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (BDO)-দের সাহায্যে বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্তত এক মাসের অগ্রিম হিসাবে বন্টনের ব্যবস্থা করা।
- সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যাতে এই মিড-ডে মিল প্রকল্পের আওতায় আসে তা সুনিশ্চিত করা।
- তাঁর জেলায় সারা বছর অর্থ ও খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত জোগান সুনিশ্চিত করা।
- গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ধার্য খাদ্য শস্যের গুণমান সুনিশ্চিত করা।
- সরকারি নিয়মানুসারে প্রকল্পটি সকল স্তরে যাতে সুপ্রয়োগ হয় সেই বিষয়ে দেখাশোনার কাজটি সুনিশ্চিত করা।
- পরিচালন বা দেখাশোনা করার জন্য কমিটি (SMC) সঠিকভাবে গঠিত হয়েছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা এবং কমিটির সভা প্রতি মাসে একবার সংগঠিত হবে এবং এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপগুলি গৃহীত হবে।
- রাজ্য সরকারকে প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে (SMC)–এর সভার সিদ্ধান্তগুলি পাঠাতে হবে।
- মিড-ডে মিল সম্পর্কিত তথ্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে জনসাধারণ এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারে এবং উপকৃত হয়।
- নির্দেশ অনুযায়ী অভিযোগ জানানোর পদ্ধতিকে সচল রাখা এবং জেলাশাসকের দপ্তরে ও বিদ্যালয়গুলির বোর্ডে তথ্য দেওয়া।
- ১ মার্চ, ২০১০-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর জেলায় অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ঠিকমত কার্যকর আছে তা নিশ্চিত করা এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে তথ্য বোর্ডে লাগানো।
- এই প্রকল্পের উন্নতিকল্পে অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে (NREGA, TSC, Fishery, SGSY, Development Fund ইত্যাদি) মিলিতভাবে কাজ করা।
- নিরীক্ষা পদ্ধতি সঠিক সময়ে সুনিশ্চিত করা।
- প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল প্রকল্পটি নিরবচ্ছিন্নভাবে সচল রাখা।
- সমস্ত বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত জলের সুব্যবস্থা রাখা।
- ধার্য অনুযায়ী রান্নাঘর নির্মাণের তদারকি করা।
- এলাকা ভিত্তিক প্রথা ও খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী রান্না সহায়িকাদের পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত রান্নার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- অনুমোদিত হার অনুযায়ী যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে সেখানে রান্নার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের নিয়োগ করা এবং তাদের সময়মত রান্নার খরচ এবং সাম্মানিক দেওয়া সুনিশ্চিত করা।
- সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তর-বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মিলিতভাবে প্রকল্পের কাজ করা।

মহকুমা শাসকের কর্তব্য এবং দায়িত্ব -

মহকুমা স্তরে মহকুমা শাসক হলেন নোডাল অফিসার। তাঁর এলাকার মিড-ডে মিলের অর্থ এবং খাদ্য শস্য তাঁর মাধ্যমেই বন্টিত হবে।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান-এর কর্তব্য এবং দায়িত্ব

ব্লক তাঁদের দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটির স্তরে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হলেন নোডাল অফিসার নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও খাদ্য শস্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করা। তিনি সব অভিযোগ নথিভুক্ত করবেন এবং সেগুলি সমাধানের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক

পশ্চিমবঙ্গে মিড-ডে মিল প্রকল্পের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর হল নোডাল দপ্তর, তাই এই দপ্তরের সব আধিকারিক মিড-ডে মিল প্রকল্প প্রয়োগের জন্য দায়বদ্ধ।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হলেন জেলাস্তরে বিভাগীয় প্রধান আধিকারিক। তাঁর দায়িত্ব হল তাঁর অধীনের সমস্ত সহকারী পরিদর্শক এবং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন নিশ্চিত করা এবং মিড-ডে মিল নিয়মিতভাবে চালু আছে কিনা তা দেখাশোনা করা ও সেই বিষয়ে তার কাছে রিপোর্ট পেশ করা এবং প্রকল্পের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের বিষয়ে জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট পেশ করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।

তিনি দপ্তরের সব আধিকারিকদের সঙ্গে সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রকল্পের নিয়মিত সরবরাহ সুনিশ্চিত করবেন এবং তা নিয়মিত পর্যালোচনা করবেন।

এ আই-এর কর্তব্য এবং দায়িত্ব

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর মিড-ডে মিল কার্যকরভাবে তদারকির জন্য এ আই-এর একটি নতুন পদ তৈরি করেছে। তাঁর দায়িত্ব নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করা এবং প্রতি মাসে তাঁর তদারকি প্রতিবেদন (ফরম্যাট-'এ'-তে) সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে পরের মাসের পঞ্চম কাজের দিনের মধ্যে জমা দেবেন। তিনি এ বিষয়টিও নিশ্চিত করবেন যে ব্লকস্তরে নিয়োজিত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকরা নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করছেন ও তাঁর কাছে এবং সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিডিওকে মতামত জানাচ্ছেন। যে সকল বিদ্যালয় ধারাবাহিকভাবে মিড-ডে মিল সরবরাহে ব্যর্থ তাদের বিরুদ্ধে তিনি জেলা

বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে জানাবেন এবং সাহায্য বন্ধের প্রস্তাব দেবেন।

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কর্তব্য এবং দায়িত্ব

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তৃণমূলস্তরে মিড-ডে মিল কর্মসূচি তদারকি করবেন। তিনি বিদ্যালয় পরিশর্ন করবেন, মিড-ডে মিল কর্মসূচি প্রয়োগের তদারকি করবেন, সংশোধনের জন্য পরামর্শ দেবেন এবং এ আই ও বিডিও-র কাছে সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ফরম্যাট-'এ'-তে মতামত দেবেন। মিড-ডে মিল সরবরাহে ব্যর্থ হলে দ্রুত মিড-ডে মিল চালু করতে লিখিতভাবে বিদ্যালয়কে নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর। নির্ধারিত সময়ের পরেও সেই বিদ্যালয় মিড-ডে মিল চালু না করলে তিনি এ আই-কে সেই বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জানাবেন। ফরম্যাট-'বি'-তে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল প্রয়োগ সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন (স্বনির্ভর দল কর্তৃক প্রস্তুত, প্রধান শিক্ষক এবং পরিচালন কমিটি / ভি ই সি কর্তৃক স্বাক্ষরিত) পরবর্তী মাসের তৃতীয় কাজের দিনের মধ্যে প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে পাঠানো তাঁর দায়িত্ব।

ভি ই সি এবং এম সি-র কর্তব্য এবং দায়িত্ব

তাঁদের এলাকার বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল কর্মসূচি তদারকি করবেন। এই কমিটি বাবা-মা এবং কম্যুনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। তাঁরা নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী স্বনির্ভর দল নিয়োগ করবেন। তাঁরা এই বিষয়টিও নিশ্চিত করবেন যে, বিডিও-র কাছে যে মাসিক প্রতিবেদন/বিল - পেশ করা হবে তাতে একজন সদস্য স্বাক্ষর করবেন। তাঁরা সঠিক সংরক্ষণ, খাদ্যের গুণমান, খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র, রান্না ঘরের স্বাস্থ্যবিধি রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবেন এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরিদর্শনকারী সরকারি আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলবেন। তাঁরা স্বনির্ভর দলকে মিড-ডে মিলের উন্নতির জন্য সব্জি-বাগান তৈরি করতে উৎসাহিত করতে পারেন।

প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা/বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের কর্তব্য এবং দায়িত্ব।

- বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল কর্মসূচি চালু রাখার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা/বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক মূল ব্যক্তি।
- তাঁর প্রতিষ্ঠানে এই কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চালু রাখা তিনি নিশ্চিত করবেন। খাদ্যশস্য / রান্নার খরচের সরবরাহের কোনও ঘাটতি হলে কোনও দেরি না করে বিষয়টি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক / সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক / পৌরপ্রতিষ্ঠান / কর্পোরেশন / পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।
- তাঁকেই নিশ্চিত করতে হবে শিশুদের ভাল গুণমানের খাবার পরিবেশনের বিষয়ে এবং সাথে সাথে নিশ্চিত করতে হবে রান্না, পরিবেশন এবং খাওয়া যেন একসাথে সবাই মিলে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে শৃঙ্খলা মেনে হয় এবং মিড-ডে মিলের সমগ্র প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে ৩০-৪০ মিনিট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে।
- তাঁকে গুরুত্ব দিতে হবে দপ্তরের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি রক্ষণাবেক্ষণ এবং গুণমানের রান্না করা খাবার সরবরাহে।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী/ রাঁধুনি-সহযোগীকে বিভিন্ন ধরনের খাবার এবং পুষ্টি বিষয়ে তিনি পরামর্শ দেবেন। তাঁর তরফে নিয়মিত তদারকি করা প্রয়োজন।
- তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের যেকোনও শিক্ষক/কর্মীর পরিসেবা যুক্তিসঙ্গত ভাবে কাজে লাগাতে পারেন।
- কতজন শিশু বিদ্যালয়ে উপস্থিত আছে এবং কতজন শিশু মিড-ডে মিল নেবে তা নির্ধারণ করতে হবে যাতে একটি নির্দিষ্ট দিনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যারা কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় পরিমান খাবার রান্না করতে পারেন।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রদত্ত মাসিক প্রতিবেদন/বিল-এ তিনি স্বাক্ষর করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে পেশ করার আগে তা ভি ই সি/এম সি-র ডাকা সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।
- তিনি নিশ্চিত করবেন একটি বোর্ডে প্রকল্প সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্য নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হবে–
  - নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা...
  - নির্দিষ্ট দিনে মিড-ডে মিল গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা...
  - নির্দিষ্ট দিনের খাদ্য তালিকা...
  - নির্দিষ্ট দিনে ব্যবহৃত চালের পরিমাণ...-নির্দিষ্ট দিনে অবশিষ্টাংশ চালের পরিমাণ...
  - সরকার কর্তৃক অনুমোদিত রান্নার খরচ এবং রাঁধুনির সাম্মানিক বাবদ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রদত্ত বিস্তারিত বিবরণ...
  - স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নাম এবং ঠিকানা...
  - অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের নাম এবং ঠিকানা...

> শিক্ষা অধিকার আইনের ২৪ নং ধারায় শিক্ষকদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ২৯ নং ধারায় পাঠক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা সঠিকভাবে ও যথাযথ রূপায়ণ করতে গেলে, মিড-ডে মিল রূপায়ণের যে দায়িত্বভার প্রধান শিক্ষককে দেওয়া হয়েছে তা কি একই সাথে করা বাস্তবে সম্ভব? এছাড়াও এই আইনের ২৭ নং ধারায় জনগণনার কাজ, বিপর্যয় মোকাবিলার দায়িত্ব এবং নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সঠিক যত্ন নিয়ে মিড-ডে মিল সরবরাহে বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে মিড-ডে মিলের দেখাশোনা ও মূল্যায়নের কাজ আরও ভাল মতো হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ এবং সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে —

১. অধ্যাপক উৎপল রায় চৌধুরি, ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড টেকনোলজি অ্যান্ড বায়ো-কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি।
২. ড. রফিকুল ইসলাম, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ রুরাল এক্সটেনশন, বিশ্বভারতী।
৩. ড. নবীনানন্দ সেন, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি।
৪. অনুরাধা তলওয়ার, অ্যাডভাইসর টু দ্য কমিশনার অফ সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া।
৫. ড. কমলেশ সরকার, অফিসার ইন-চার্জ, ন্যাশনাল নিউট্রিশন এ্যান্ড মনিটরিং ব্যুরো (এন এন এম বি) ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিট।
৬. কুমার রাণা, প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট, প্রতীচী ইনস্টিটিউট।

রাজ্যস্তরে মিড-ডে মিল সংক্রান্ত অভিযোগ নিম্ন লিখিত নম্বরে জানানো যেতে পারে —

দূরভাষ — (০৩৩) ২৩৫৯ ৬৭৬১, ৬৭৯৮, ৬৭৯৯, ফ্যাক্স — (০৩৩) ২৩৩৪৪০৫২
ই-মেল ঃdirector.cmdmp@gmail.com

মিড-ডে মিল - স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা

বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর, বিশেষত বিহারের ধরমসতী গ্রামে ২৩ জন শিশুর মৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর গত ১৭ জুলাই মিড-ডে মিলের খাবারের স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা সচিব এক নির্দেশিকা জারি করেছেন। নির্দেশিকা (No.417 (65) - SSE/13 dated, Kolkata, the 17th July, 2013) অনুযায়ী প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল রান্না ও সরবরাহের সময় স্বাস্থ্যবিধি এ নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে শিশুদের খাবার সরবরাহের আগে একজন শিক্ষক এবং রাঁধুনি খাবার খেয়ে দেখে নিয়ে তারপরেই শিশুদের খাবার পরিবেশন করবে। এই নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, পরিদর্শক আধিকারিকরা তাঁদের এলাকার সব বিদ্যালয়ে এই নির্দেশের পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শনের সময় শিশুদের খাবার পরিবেশনের আগে তারা খাবার দেখে নেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ ২০১১ সালের ৯ জুন, মুখ্য সচিবের পক্ষ থেকে মিড-ডে মিল সংক্রান্ত এক নির্দেশিকাতেও (No.111-CS/2011) বলা হয়েছিল শিশুদের খাবার সরবরাহের আগে কমপক্ষে একজন শিক্ষক সহ ২-৩ জন কম্যুনিটি সদস্য খাবার খেয়ে দেখে নেবেন। সেই নির্দেশিকায় সকল স্তরের আধিকারিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।

মিড ডে মিল - ওয়েবেনের সমীক্ষা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে মিড-ডে মিল বিষয়ে একটি সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল মিড-ডে মিল সম্পর্কে যে পরম্পরা বিরোধী মতামত শোনা যায় সে বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মত জানা। ৯টি জেলার ১১৩টি বিদ্যালয়ে সমীক্ষা করা হয়েছিল। ৩টি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছিল - ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নির্বাচিত অভিভাবক-অভিভাবিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিদ্যালয়ে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশ্নগুলি করা হয়।

সমীক্ষাতে বাঁকুড়া জেলার ১০টি বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনার ৯টি বিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদের ১৫টি বিদ্যালয়, বর্ধমানের ১২টি বিদ্যালয়, হুগলীর ৮টি বিদ্যালয়, মালদার ১১টি বিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুরের ১১টি বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২১টি বিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬টি বিদ্যালয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে।

মোট ৫৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রী, ২১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ৫২৬ জন অভিভাবক-অভিভাবিকার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য

নিয়মিত মিড-ডে মিল সরবরাহ

বিদ্যালয়ে নিয়মিত মিড-ডে মিল দেওয়া হয় কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে ৯৮.২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীই জানিয়েছেন মিড-ডে মিল দেওয়া হয়। একই প্রশ্নের উত্তরে ৯৮ শতাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা জানিয়েছেন মিড-ডে মিল দেওয়া হয়। অভিভাবকদের ৯৩ শতাংশ জানিয়েছেন মিড-ডে মিল দেওয়া হয়। মূল্যায়নের দিনগুলিতে মিড-ডে মিল দেওয়া হয় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের ৫৮.৪ শতাংশ জানিয়েছেন দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে বিশেষ পালনীয় দিন গুলিতে মিড-ডে মিল দেওয়া হয় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৪৪.২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী জানিয়েছেন দেওয়া হয়। অর্থাৎ কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নিয়মিত মিড-ডে মিল দেওয়া হয় একথা বলা যেতে পারে।

লেখা-পড়ার ওপর প্রভাব

মিড-ডে মিলের কারণে লেখা-পড়ার ওপর কোনও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ২৬.৩ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী জানিয়েছেন কিছুটা ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই মনে করেন, ক্ষতি হয় না। এই একই প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ২৯.৮ শতাংশ জানিয়েছেন কিছুটা ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাবনার সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাবনার মিল খুব কাছাকাছি। কিন্তু অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ৪৯.৮ শতাংশ মনে করেন লেখা-পড়ার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে এ বিষয়ে অভিভাবকদের মতের পার্থক্য রয়েছে।

বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের পরেও ক্লাস হয় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৮২.৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী জানিয়েছেন ক্লাস হয়। একই প্রশ্নের উত্তরে ৯২.২ শতাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা জানিয়েছেন ক্লাস হয়। শতকরা হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য থাকলেও উভয়পক্ষের অধিকাংশেরই বক্তব্য মিড-ডে মিলের পরেও ক্লাস হয়।

শিক্ষকদের যুক্ত থাকা না থাকা

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মিড-ডে মিলের কাজে যুক্ত থাকা উচিত কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মতামত খুব কাছাকাছি। ছাত্র-ছাত্রীদের ৩৯ শতংশ, অভিভাবকদের ৩৮ শতাংশ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ৩৬.২ শতাংশ যুক্ত থাকার পক্ষে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ অধিকাংশই যুক্ত না থাকার পক্ষে মত দিয়েছেন।

মিড-ডে মিল চালু রাখা

অভিভাবকদের ৭৩.৪ শতাংশই মিড-ডে মিল চালু রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ৮৩.৫ শতাংশ মনে করেন মিড-ডে মিল চালু রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ৪৯.৮ শতাংশ যদিও মনে করেন মিড-ডে মিলের ফলে লেখা-পড়ার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, তবুও মিড-ডে মিল চালু রাখার পক্ষেই অধিকাংশ অভিভাবক-অভিভাবিকা মতামত দিয়েছেন।

ওয়েবেনের প্রস্তাব

- যে অল্প ক্ষেত্রে মিড-ডে মিল নিয়মিত নয় এবং যেসকল বিদ্যালয়ে এখনও মিড-ডে মিল চালু হয়নি, বা কখনও চালু হলেও পরে বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে মিড-ডে মিল নিয়মিত চালু করতে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ।
- অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মিড-ডে মিল পরিচালনার মূল দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা উচিত;
- সঠিক যত্ন ও সুরক্ষাসহ মিড-ডে মিলের জন্য বিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যেই একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রতি বিদ্যালয়ে নিয়োগ করতে হবে;
- মিড-ডে মিল সরবরাহে কোনও ভাবেই বেসরকারিকরণ করা চলবে না;
- পুষ্টি ও গুণমান বজায় রাখতে বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে এবং সময় মতো সে বরাদ্দ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা;
- শিশুর সুরক্ষার স্বার্থে মিড-ডে মিলের ওপর বিভিন্নস্তরে নিয়মিত নজরদারি রাখা।

মিড-ডে মিল-এ রাজ্যও নিরাপদ নয়

সেপ্টেম্বর, ২০১১	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলায় একটি বালিকা বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল খাবার পর ১০০ জন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে
জুন, ২০১২	পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে ৬০ জন আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে
সেপ্টেম্বর, ২০১২	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একটি মাদ্রাসায় মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে ৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে
মার্চ, ২০১৩	বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে এক ছাত্রী মৃত্যু হয় এবং ৪২ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে
এপ্রিল, ২০১৩	পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনিতে একটি বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে ১৪৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে
জুলাই, ২০১৩	নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়ার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গরম তরকারির গামলায় পড়ে এক শিশুর ৪০ শতাংশ পুড়ে যায়

সূত্র : দৈনিক সংবাদপত্র - এই সময়

ছবি ঃ ইন্টারনেট

গুণমানের শিক্ষা ও শিক্ষা অধিকার আইন

''আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে, বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।''

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষার হেরফের, সাধনা, পৌষ, ১২৯৯

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে প্রবাসী পত্রিকার বৈশাখ, ১৩২৩ সংখ্যায় ইউরোপীয় স্কুলের ব্যয় শীর্ষক লেখায় লেখা হয়েছে, ''যে-সকল স্কুলে প্রধানত: ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্র-ছাত্রী পড়ে তাহাদিগকে ইউরোপীয় স্কুল বলে। এই সকল ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ১০,০৭৪। তাহাদের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট ১৯১৪-১৫ সালে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ১১,৮৫,২৩৯ দিয়াছিলেন। ওই সালে দেশী ছাত্র-ছাত্রী ১৭,৩৬,৯৬৭ জনের জন্য গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে দিয়াছিলেন ৬৪,৯৯৩৩৬ টাকা, অর্থাৎ জন প্রতি চারি টাকারও কিছু কম। এক একটি ইউরোপীয় এ ইউরেশীয় ছাত্র-ছাত্রীর জন্য গবর্ণমেন্ট যাহা খরচ করেন, তাহা দেশী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য গবর্ণমেন্টর ব্যয়ের ত্রিশ গুণ। এরূপ অসাম্য বাঞ্ছনীয় নয়, আমরা যে হারে ট্যাক্স দি, ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়রা তাহার ত্রিশ গুণ অধিক হারে ট্যাক্স দেয় না। তাহারা অবনত শ্রেণির লোকও নহে, যে, তাহাদের জন্য অনেক বেশি ব্যয় ন্যায়সঙ্গত হইবে।''

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে বহুস্তরীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এই অবাঞ্ছনীয় বৈষম্য আজও বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ এই বৈষম্যকে ব্যামো বলেছেন। শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ লেখায় তিনি বলেছেন, ''সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-পরে পরিপুষ্ট থাকবে আর নীচের থাকের লোক অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে, সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। এই অসারতার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো ''(বিশ্বভারতী বুলেটিন, ২০ মাঘ, ১৩৪২)

আমরা যে শিক্ষা অধিকার আইন প্রসঙ্গে এই আলোচনা করছি সেই আইনেও এই বহুস্তরীয় বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই শীলমোহর দেওয়া হয়েছে। ধারা ২-এর উপধারা (পি) তে বলা হয়েছে, বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত বলতে বোঝাবে এমন বিদ্যালয়কে যা পরিচিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয়, বিদ্যালয়, সৈনিক বিদ্যালয় অথবা এমন কোনও বিদ্যালয়, সংশ্লিষ্ট সরকারের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যার বিশেষ স্বাতন্ত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার কোনও একটি দেশের শিক্ষানীতি তার সামগ্রিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সকল ক্ষেত্রে যখন বিশ্বায়নের অর্থনীতির স্বার্থে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যকরণ চলছে শিক্ষা তার বাইরে থাকবে এটা আশা করা যায়না। যেখানে সব কিছুই পণ্য শিক্ষাও সেখানে পণ্যে পরিণত হবে এটাই স্বাভাবিক। সেই কারণেই শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যকরণের বিরুদ্ধে এই আইনে কোনও কথা বলা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা অধিকার আইনের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই আইনের ইতিবাচক দিকগুলি প্রয়োগের বিষয়ে আমাদের আলোচনা করা উচিত। গুণগত মানের শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ধারা গুলি আমরা প্রথমে আলোচনা করে নিলে বুঝতে পারব বাস্তবে তা প্রয়োগের পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়িয়ে। বিনা ব্যয়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯-এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ধারা ২৯ নং ধারা।

ধারা - ২৯ (১) সংশ্লিষ্ট সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গঠিত শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বুনিয়াদি (১ম-৮ম শ্রেণি) শিক্ষার পাঠক্রম-এ মূল্যায়ণ পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেবেন।

২) উপধারা (১) অনুযায়ী পাঠক্রম এবং মূল্যায়ণ পদ্ধতি তৈরি করার সময়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন -

এ) সংবিধানের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা,

বি) শিশুর সার্বিক বিকাশ

সি) শিশুর জ্ঞান, সম্ভাবনা এবং প্রতিভার নির্মাণ

ডি) দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ

ই) কাজের মধ্যে দিয়ে শেখা, শিশু কেন্দ্রিক এবং শিশু বান্ধব পদ্ধতিতে আবিষ্কার ও অণ্বেষণ করা

এফ) শিক্ষার মাধ্যম হবে (যতটা সম্ভব) শিশুর মাতৃভাষা,

জি) শিশুটিকে ভয়, আতঙ্ক বা উদ্বেগ মুক্ত রেখে স্বাভাবিকভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে সাহায্য করা,

এইচ) শিশুর কোনো বিষয়কে বোঝা এবং তাকে কাজে লাগানোর সক্ষমতার সার্বিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ণ।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই ২৯ নং ধারাটি জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি। বলা বাহুল্য, ২৯ নং ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব অপরিসীম। সেই কারণেই ২৪ নং ধারায় শিক্ষকদের দায়িত্ব অংশে বলা হয়েছে -

২৪. (১) ধারা ২৩-এর (১) উপধারা অনুযায়ী একজন শিক্ষক নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন :-

(এ) বিদ্যালয়ে নিয়মিত এবং সময় মতো আসা,

(বি)ধারা ২৯-এর (২) উপধারা অনুযায়ী পাঠক্রম পরিচালনা ও তা সমাপ্ত করা

(সি) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমগ্র পাঠক্রম সম্পূর্ণ করা,

(ডি) প্রত্যেক শিশুর শেখার সক্ষমতা খতিয়ে দেখা এবং সেই অনুসারে প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত সাহায্য করা,

(ই) বাবা-মা এবং অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত সভা করা এবং শিশুর নিয়মিত উপস্থিতি, শেখার সক্ষমতা, শেখার অগ্রগতি এবং অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক তথ্য বিষয়ে তাঁদের অবহিত করা,

এবং

(এফ) নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা

(২) উপধারা (১)-এর নির্দেশ অনুযায়ী কোনও শিক্ষক দায়িত্ব পালন না করলে চাকরির নিয়ম অনুযায়ী তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হবেন। তবে, সেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে সেই শিক্ষককে তাঁর বক্তব্য পেশ করার যথাযথ সুযোগ দিতে হবে।

(৩) শিক্ষকের কোনও অভিযোগ থাকলে নির্দেশ অনুযায়ী তা নিষ্পত্তি করতে হবে।

ধারা ২৯-এর উপধারা (২) এর (জি) অনুচ্ছেদ-এর সাথে আইনের ১৭ নং ধারার সঙ্গতি রয়েছে।

ধারা ১৭. (১) কোনও শিশুকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া যাবে না

(২) উপধারা (১)-এর নির্দেশ যে ব্যক্তি লঙ্ঘন করবে চাকরির নিয়ম অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো যথাযথ করতে আইনের ১৯ এবং ২৫ ধারার সাথে পরিশিষ্টের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

ধারা ১৯. (১) কোনও বিদ্যালয়ই ১৮ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত অথবা স্বীকৃতি পাবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত পরিশিষ্ট নির্দিষ্ট নীতি ও মান পূরণ হবে।

(২) এই আইন কার্যকর হওয়ার আগে প্রতিষ্ঠিত কোনও বিদ্যালয় যদি পরিশিষ্ট নির্দিষ্ট নীতি ও মান অনুযায়ী না হয় তাহলে এই আইন কার্যকর হওয়ার তিন বছরের মধ্যে নিজের খরচে সেই নীতি ও মান অর্জনের জন্য তাকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৩) উপধারা (২) নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সেই নির্দিষ্ট নীতি ও মান অর্জন করতে না পারলে ধারা ১৮-এর (১) উপধারা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার উপধারা (৩) অনুযায়ী বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেবে।

(৪) উপধারা (৩) অনুযায়ী স্বীকৃতি প্রত্যাহারের দিন থেকে কোনও বিদ্যালয় চালু থাকতে পারবে না।

(৫) স্বীকৃতি প্রত্যাহারের পরেও কেউ যদি বিদ্যালয় চালু রাখেন তবে এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, আর লঙ্ঘন হতে থাকলে প্রতিদিন দশ হাজার টাকা করে জরিমানা হবে।

ধারা ২৫.(১) সংশ্লিষ্ট সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন চালু হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে পরিশিষ্টে বর্ণিত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিশ্চিত করবে।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় রাখার জন্য একটি বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষককে অন্য কোনও বিদ্যালয়ে, অফিসে বা শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্য কোনও কাজে (ধারা ২৭-এ নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া) নিযুক্ত করা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হল, আইনে এত ধারা এবং উপধারা থাকলেও সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসন তা কার্যকর করতে কতটা উৎসাহী এবং আমাদের সমাজও তা গ্রহণ করতে কতটা প্রস্তুত। বিশেষ করে ১৭ নং ধারা অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ এবং ২৯ নং ধারার ২ উপধারার(এইচ) অনুচ্ছেদ অর্থাৎ ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পর্কে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। বহু শিক্ষক সংগঠন প্রকাশ্যেই এর বিরোধিতা করেছেন।

১৭ নং ধারা সংক্রান্ত রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিটিও এই প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি রাখে। আইনের মূল সুরের সঙ্গে এই বিজ্ঞপ্তির বেশ কিছু অংশ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এবারে আমরা একটু বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে দেখি।

ASER, 2012 রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে অষ্টম শ্রেণির ৩ শতাংশ শিশু বড় অক্ষরও পড়তে সক্ষম নয়। অষ্টম শ্রেণির কেবলমাত্র ৪০.২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী সহজ বাক্য পড়তে সক্ষম। অষ্টম শ্রেণির ৪২.৭ শতাংশ শিশু ভাগ করতে পারে। ২১.৭ শতাংশ বিয়োগ করতে এবং ৩০.৪ শতাংশ ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে সক্ষম।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে গ্রামস্তরে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রচার কর্মসূচির সময় স্বেচ্ছাসেবকরা বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই তথ্যে দেখা যাচ্ছে ১০টি জেলায় ৫৭ টি ব্লকের ২০৬টি গ্রামে মোট ৮৯২ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এই শিশুদের কেউ কেউ বিদ্যালয়ের আঙিনায় পৌঁছতে পারেনি, আর অধিকাংশই বিদ্যালয়ের আঙিনায় প্রবেশ করলেও নানা কারণে তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যায়নি। মাঝপথে তারা বিদ্যালয় ছুট হয়েছে।

কিন্তু যেসকল শিশু বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে তারা বিদ্যালয়ে কেমন পরিবেশ পাচ্ছে, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো কেমন, তারও একটা চিত্র ওয়েবেনের স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রাম প্রচারের সময় পেয়েছেন। ১১টি জেলায় মোট ২৩৪টি বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে ৪৮টি বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ৯৫টি বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা নেই ১৫৬ টি বিদ্যালয়ে। গ্রন্থাগার নেই ১৫৪ টি বিদ্যালয়ে। খেলার মাঠ নেই ১৫৪ টি বিদ্যালয়ে। ৮৭টি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মাদুর পেতে অথবা অন্য কোনও আসন পেতে নীচে বসতে হয়। ২১ টি বিদ্যালয়ে অর্ধেক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীকে নীচে বসতে হয়। ১৬৯টি বিদ্যালয়ে প্রাচীর নেই, ৮টি বিদ্যালয়ে আংশিক প্রাচীর আছে। ৭৪টি বিদ্যালয়ে রান্না ও খাবারের জন্য পৃথক পরিকাঠামো নেই।

এই সকল ন্যূনতম বস্তুগত পরিকাঠামো এখনও পর্যন্ত যেখানে গড়ে ওঠেনি, সেখানে ভাবগত পরিবেশই বা কেমন? বিশেষ করে ২৯ নং ধারায় বর্ণিত কাজের মধ্যে দিয়ে শেখা, শিশু কেন্দ্রিক এবং শিশু বান্ধব পদ্ধতিতে আবিষ্কার ও অন্বেষণ করা এবং শিশুটিকে ভয়, আতঙ্ক বা উদ্বেগ মুক্ত রেখে স্বাভাবিকভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে সাহায্য করার সংস্কৃতিও গড়ে ওঠেনি। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ।

বস্তুগত পরিকাঠামোর চাইতে এই ভাবগত পরিকাঠামোর গুরুত্ব কোনও অংশেই কম নয়, বরং বহু ক্ষেত্রেই বেশি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উদ্ধৃত করছি, ''মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি, কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার''। (শিক্ষার বাহন, সবুজ পত্র, পৌষ, ১৩২২)

ছাত্র-ছাত্রীর সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকার মানবিক সম্পর্ক, অভিভাবকদের সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকার সম্পর্ক ক্রমশ— অবনতি হচ্ছে। দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর শিক্ষক-শিক্ষিকার নির্যাতন এবং অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরেই তার প্রমাণ মেলে।

আমাদের মনে হয়েছে তৃণমূল স্তরে এই বিষয়গুলি নিয়ে যত বেশি চর্চা হবে, বিতর্ক হবে ততই আমরা আইন বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাব। প্রয়োজন গণ উদ্যোগ। সরকার এবং প্রশাসনের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। ভুললে চলবে না টলস্টয়ের সেই উক্তি, "The strength of Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightement. It is time we realized that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightement of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo - educational establishments which it controls: schools, high schools, universities, academics, and all kinds of committees and congresses"।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের সাধারণ পরিষদের ২য় সভা

গত ২৩ অগষ্ট অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর সভাগৃহে ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের সাধারণ পরিষদের ২য় সভাটি আয়োজিত হয়। এই সভার মূল আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল - ১) ফোরামের সংবিধান নিয়ে পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন, ২) সংবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন কমিটি গঠন, ৩) গত বছরের কর্মসূচি পর্যালোচনা ও পরবর্তী বছরের কর্মসূচি নির্ধারণ। সংবিধানটি পরিবেশন করেন ফোরামের অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক স্বপন পন্ডা। ফোরামের সংবিধান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়। এরপর ফোরামের সম্পাদকীয় কমিটি গঠন করা হয় সদস্য সংগঠনের পক্ষ থেকে ১ জন করে সদস্য নিয়ে, যারা তাঁদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ফোরামের সাধারণ পরিষদে আছেন, তাদের মধ্য থেকেই এই কমিটি গঠন করা হয়। ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে স্বপন পন্ডা ও ম: ইসরাফিল-এর নাম মনোনীত হয়, যারা আগামী তিন বছরের জন্য এই পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন। এই পর্বটি পরিচালনা করেন ফোরামের সদস্য বিপ্লব দাস। সিদ্ধান্ত হয় যে সংবিধান অনুসারে অন্যান্য কমিটিগুলি গঠন করবে সম্পাদকমন্ডলী। এরপর গত বছরের কর্মসূচিগুলি নিয়ে আলোচনা হয় এবং সেপ্টেম্বর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা স্থির করা হয়। শ্রী পন্ডা ২০১৪ সালের পরিকল্পনা পেশ করেন। উপস্থিত সকলেই এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পরবর্তী সম্পাদকমন্ডলীর সভা হবে বলে স্থির করা হয়। এই সভায় বিভিন্ন নেটওয়ার্ক/অ্যালায়েন্স, এনজিও, শিক্ষক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রায় ১০০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শিক্ষা অধিকার আইন-এর যথাযথ প্রয়োগ বিষয়ে শিক্ষক ইউনিয়নের সঙ্গে সভা

শিক্ষা অধিকার আইন লাগু হওয়ার ৩ বছরেরও বেশি অতিক্রান্ত হলেও এরাজ্যে আইনটি আজও যথাযথ প্রয়োগ হয়নি। এই বিষয়ে শিক্ষক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি অনস্বীকার্য। আইনের প্রয়োগের বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করতে এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরাম এবং শিক্ষক ইউনিয়নদের যৌথ উদ্যোগে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করতে গত ৩১ অগষ্ট একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর সভাগৃহে। এই সভায় ফোরামের সদস্য ছাড়াও ৩টি শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অ্যাক্ট-এর পক্ষ থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন অধ্যাপক মৃণ্ময় ভট্টাচার্য্য। সভায় পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষকদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী রাজকুমার রাহা, বিপিটিএ-র পক্ষ থেকে সম্পাদক চঞ্চল কুমার বসু, সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সুদীপ নারায়ণ গোস্বামী। তাঁরা তাঁদের সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষা অধিকার আইন-এর প্রয়োগের বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক দীপক কুমার দাস। অধ্যাপক মৃণ্ময় ভট্টাচার্য্য বেশ কিছু প্রস্তাব রাখেন। ফোরামের পক্ষ থেকে যৌথ আহ্বায়কদের অন্যতম শ্রী স্বপন পন্ডা বেশ কিছু প্রস্তাব রাখেন। সিদ্ধান্ত হয় আগামী সেপ্টেম্বরে সকল শিক্ষক সংগঠনকে নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং পরবর্তী কর্মসূচি স্থির করা হবে। এই সভাটি পরিচালনা করেন ফোরামের অন্যতম সদস্য শ্রী প্রবীর বসু এবং অধ্যাপক মৃণ্ময় ভট্টাচার্য্য।

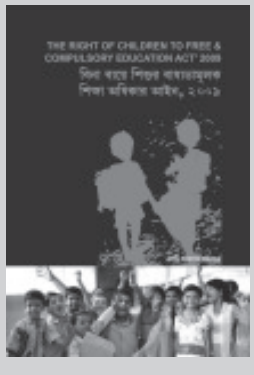

সংগ্রহ করুনঃ

শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পূর্ণ ইংরেজি আইন ও তার বাংলা রূপান্তর

প্রকাশক – ওয়েবেন
বিনিময় - ২০ টাকা মাত্র
(ওয়েবেন রাজ্য অফিসে পাওয়া যাবে)

সুস্মিতা চন্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ *অনুদান : ৩ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য